ছয় দফা : বাঙালির মুক্তিসনদ

সেলিনা হোসেন

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কৈশোর থেকে সূচিত রাজনৈতিক জ্ঞানের ধারাবাহিকতায় তৈরি করেছিলেন বাঙালির অধিকার সচেতনতার মূল সূত্র ৬ দফা কর্মসূচি। তিনি এই রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞকে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছয় দফা বাঙালি জাতির অধিকার অর্জনের সচেতন পদক্ষেপ। কিশোর বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু মাটি-মানুষ বিষয়ে জ্ঞানের যে প্রজ্জ্বলনে নিজেকে দীপ্ত করেছিলেন সেই সাধনায় বাঙালির মুক্তিসনদ তৈরি হয়েছে ছয় দফার দীপ্ত আলোতে – তিনি ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন রাজনীতির শক্ত পাটাতনে। তিনি দেখেছেন কীভাবে শোষণ করা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানকে। দেখেছেন বাংলার সোনালি আঁশ পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। আর সেই টাকা দিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার আরও নানাদিক তিনি গভীর পর্যবেক্ষণে করায়ত্ত করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সেশন চলছিল। গণপরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছেন : 'Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal.' We have demanded so many times that you should use Bengal instead of East Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own.'

এই কথা বলে তিনি পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানতে পারেননি। গণমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: 'You can change only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back in Bengal and ask them whether they accept it.' ভূখণ্ডের নামের অধিকার আদায়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন অমিত সাহসে।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭ দিন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ চলার সময় পূর্ব পাকিস্তানকে একদম অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে ভারতের আক্রমনের মোকাবেলা করতে পারত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন এভাবে যে, 'চীনের ভয়ে ভারত পূর্বপাকিস্তানে যুদ্ধে জড়াতে সাহস করেনি।' এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭ দিন যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লেফট রাইট করে হেঁটে যেত তবুও তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না। আর চীনই যদি আমাদের রক্ষাকর্তা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেই হয়।' বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রবলভাবে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য ৬ দফা দাবী প্রণয়ন করেন।

১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দমননীতিমূলক একতরফা সরকার পরিচালনা পদ্ধতি দেখতে দেখতে বঙ্গবন্ধু নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। বঞ্চনা ও শোসনের যাঁতাকলে পূর্ববঙ্গবাসীর বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক পথচলার ধারা অনবরত বেগবান করেছেন। রাজনীতি বোঝার বোধের তীক্ষ্ণতায় সমসাময়িক সময়ে অন্যদের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর দুজন প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তি শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানি শাসকেরা যেভাবে নানা কৌশলে অপদস্ত করেছে সেটিও ছিল তাঁর বোঝার শিক্ষা। পিছুহটার চিন্তা তিনি কখনো করেননি। এগিয়ে যাওয়ার মননশীল দৃঢ়তা তাঁর চেতনার প্রদীপ্ত শিখা। তিনি বাঙালির স্বদেশ চেতনা উপেক্ষা করে শাসকগোষ্ঠীর হাতে নিপীড়নের ভয়ে ভীত ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা প্রণয়ন করেন। এর মূল দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু দফা দাবিকে বাঙালির মুক্তিসনদ হিসেবে তুলে ধরেন। ছয় দফার প্রতিটি দফায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন দিক ----

"১নং দফায় বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।...." পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার এটি একটি দিক।

২নং দফায় বলা হয়েছে, "ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।...." পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর অধিকারের ব্যাপারে এটি এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

৩নং দফায় বলা হয়েছে, "এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।...." এই দফাও প্রদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য।

৪নং দফায় বলা আছে, "সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।...."

৫নং দফায় বলা আছে, "এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।...."

৬নং দফায় বলা আছে, "এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম

পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবি হালে আত্মরক্ষা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা? ....”

বঙ্গবন্ধু এভাবে পাকিস্তান সরকারের সামনে বাঙালির অধিকার আদায়ের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলোর অধিকারের কথাও বলেছিলেন। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদের ‘গ’ ধারায় বলা হয়েছিল : ‘প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত।’ কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের পরে এই বিষয়টিকে প্রবলভাবে উপেক্ষা করেছে শাসকগোষ্ঠী। তারা পুরো ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত রাখে। প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করে। ইসলামি সংস্কৃতি চালু রাখার জন্য বাঙালির বাংলা ভাষাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। ফলে ইতিহাসের নির্মম পরিণতি তার নিয়তির লিখন হয়েছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ‘বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা’ প্রবন্ধে লিখেছেন : “১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ অঞ্চলের সুরক্ষার কোনো গুরুত্বই ছিল না। ভারতের দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে। ভারত সে সময় যদি পূর্ববঙ্গে ব্যাপক আক্রমণ চালাত, তাহলে ১২শ’ মাইল দূর থেকে পাকিস্তান কোনোভাবেই এ অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারত না। অপরদিকে তখনকার যুদ্ধের চিত্র যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখি পাকিস্তানের লাহোর পর্যন্ত ভারত দখল করে নিত, যদি না বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকেরা সাহসের সঙ্গে ভারতের সামরিক আক্রমণের মোকাবিলা করত। ..... পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান যে কোনো উপায়ে এই আন্দোলন দমন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে। কিন্তু তাদের শত নির্যাতন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের মানুষ ৭ জুনের হরতাল পালন করে ৬ দফার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়ে দেন। পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত জবাব পায়। দুঃখের বিষয় হলো, বিনা উস্কানিতে জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ ১১ জন নিহত হন। আন্দোলন দমন করতে নির্যাতনের মাত্রা যত বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষ তত বেশি আন্দোলনে শামিল হতে থাকেন।

৭ জুন হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন : ‘১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছেন। তাঁরা ৬ দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়। বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা চায়; শ্রমিকের ন্যায্য দাবি, কৃষকদের বাঁচার দাবি তাঁরা চায়, এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল’ (কারাগারের রোজনামচা পৃ. ৬৯)।”

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আইয়ুব খানের বিরোধী দলগুলো একটি বৈঠকে বসে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি সভার বিষয়সূচিতে সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতি ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলি। তিনি সভায় ছয় দফা দাবির পুরো আলোচনা করতে সম্মতি দেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক নেতারা ছয় দফাকে সমর্থন করেন না। তারা ছয় দফাকে পাকিস্তান ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে এবং এর তীব্র বিরোধিতা করে।

অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোও বঞ্চিত শোষিত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতটি উপেক্ষা করে তারা প্রবল বিরোধিতা করে। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোও বিরুদ্ধাচারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলও বিরোধীতা করে। পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় ৬ দফার গুরুত্ব অস্বীকার করে। তার দুটি নমুনা এমন ———

দফায় দফায় (দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ মার্চ ১৯৬৬)
মিথ্যা প্রতিশ্রুতির রঙিন ফানুস উড়াইয়া যারারা জনসাধারণের ঐক্যকে নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, তাহারা যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে কাজ করিতেছেন না, তা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার লক্ষ্য। রাজনৈতিক কলহ-কোলাহলে অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ক্ষয় করিয়া দিয়া দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে যাহারা বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে, জনসাধারণ তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। এ দেশের মানুষ আর দফায় দফায় প্রবঞ্চিত হইতে চাহে না।

ছয় দফার নামে (পয়গাম ৩১ মার্চ ১৯৬৬)
বিরোধী দলগুলির বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন যুক্ত এবং বিযুক্ত বহু দফার রাজনীতির স্বরূপ জনগণ ভালো করিয়াই এত দিনে ধরিয়া ফেলিয়োছে। ১৯৫৪ হইতে তাঁরা বারবার এসব চাল দফায় দফায় দিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৪ হইতে ১৯৬৬ সনের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। জনগণ তাদের স্বার্থের শত্রু-মিত্রকে এই সময়ের মধ্য ভালোভাবেই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ছয় দফা হোক আর যেকোনো দফাই হোক, আর কোনো ভাঁওতায়ই তারা এবার ভুল করিবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।"

ইত্তেফাক পত্রিকা চমৎকারভাবে পক্ষে লেখে :
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ ১৯৬৬)
যখনই এ অঞ্চলের মানুষ অন্যায়-আসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তখনই তাদের দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের, আঞ্চলিকতাবাদের, সংহতি বিনষ্টের অপবাদ। ... জননেতাদের শত্রুর চর আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকালে মরহুম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে শেষ বয়সে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছে। সর্বজনমান্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারারুদ্ধ ও দেশ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। তরুণ বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবসহ এতদঞ্চলের প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই কেন?
এর একমাত্র এবং সহজ ও সোজা উত্তর হচ্ছে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য। কারণ, সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মুখে রক্ত সঞ্চালনের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয়, তেমনি বৃহত্তর জনসমাজকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে মুষ্ঠিমেয় ভাগ্যবানের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং সকল মানুষকে অধিকারবঞ্চিত রেখে এক স্থানে এবং সমস্ত শক্তি এক হাতে ধারণের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন।"

১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পরে সাংবাদিকদের ছয় দফার ব্যাখ্যা দেন। এই দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ বলে উল্লেখ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে ছয় দফা দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। এরপরে তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় জনসমাবেশ করেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ মানুষ সমবেত হয়ে ছয় দফার কথা শোনেন।

তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেন তার শুরুটা এমন :
'আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,
আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়াই উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি- তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে।"

তিনি শেষ করেছেন এভাবে -'আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান
৪ চৈত্র ১৩৭২"

বঙ্গবন্ধু ৬-দফা দাবির পক্ষে নিজের অবস্থান দৃঢ় করলেন। ৬-দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র তৈরির কারখানা থাকবে। সামরিক একাডেমি এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ৬-দফার এই বাঁচার দাবি ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। সরকারের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর জনসভায় শিল্পীরা প্রাণের আকুতি মিশিয়ে গাইলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', আর জনসভার হাজার হাজার মানুষ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে তুলে সমর্থন জানাল। শুরু হলো ৬-দফার জয়যাত্রা।

সরকারের হুমকি দমাতে পারেনি বাঙালিকে। ৬-দফা মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি দেখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান হুমকি দিলেন এভাবে 'প্রয়োজন হলে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেয়া হবে।' বঙ্গবন্ধু কঠিন স্বরে বললেন, 'কোনো হুমকিই জনসাধারণকে ৬-দফা দাবি আদায় আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।"

শুরু হলো ধরপাকড়। নির্যাতন। জেলজুলুম। সেটি ছিল গণজাগরণের বিস্ফোরিত সময়। বাঙালি রাস্তায় নেমেছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লক্ষ্য অর্জন ছাড়া ঘরে ফিরবে না। বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতেন : "সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। মুহুর্মুহু করতালি ও গগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বঞ্চিত বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই- কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।"

৭ জুন দেশব্যাপী ছয় দফার দাবিতে হরতার পালনের আহ্বান জানানো হয়। রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ '৭ জুন একটি ভাস্বর দিন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন : "আমার স্মৃতিপটে এখনো ভাস্বর হয়ে আছে দিনটি। ..... সেদিনের হরতাল কর্মসূচিতে ধর্মঘটি ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী নির্বিচার গুলিবর্ষণ করে। ফলে তেজগাঁওয়ে শ্রমিক মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহসহ ১১ জন শহীদ হন এবং প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে হরতাল সফল করার দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা খালেক মোহাম্মদ আলী ও নূরে আলম সিদ্দিকী। তাঁরা সেখানে বক্তৃতা করেন। প্রকতপক্ষে ৭ জুন ছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে আরম্ভস্থল তথা যাত্রাবিন্দু।... ছয় দফার পক্ষে ৭ জুনের হরতাল এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে এ সম্পর্কে কোনো রকম প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মানিক মিয়া তাঁর কলামে লেখেন, ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য গৃহীত নিষ্ঠুর ব্যবস্থাদির কারণে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হলো এই যে জনসাধারণ ছয় দফা আন্দোলন তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনেকে তাদের নিজেদের আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে। ৭ জুনের সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ও ছয় দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে ইত্তেফাক-এর ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২(১) ধারার আওতায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার এবং দ্য নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে।.... ৭ জুন যে সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবিতে আমরা ছয় দফার পক্ষে সংগ্রাম করেছিলাম, সেই কর্মসূচির ফলই হচ্ছে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। ৭ জুন ছিল এর সূচনাবিন্দু।"

১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করার পরে দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১)'ক' নম্বর ধারায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর সাংবাদিকদের বলতেন, 'আমি যতদিন গভর্ণর, শেখ মুজিবকে জেলেই থাকতে হবে।'

৬ দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। জনগণ মিছিলে গণআন্দোলনের সাহসে উজ্জীবিত হয়। প্রায় আটশত লোককে গ্রেফতার করে মোনায়েম খান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ৬ দফার সমর্থনে হরতাল পালন শুরু হয়। ছাত্রজনতা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ১৪৪ ধারা জারী করে গভর্ণর। স্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনব।'
এই সময় বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা জারী করা হয়।' প্রবল প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গবাসী।

আওয়ামী লীগ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে' প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললে পুলিশের নির্যাতনে শহীদ হয় অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলনের প্রথম শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান পরে শহীদ হয় স্কুলছাত্র মতিউর রহমান। শহীদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চাপে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে।

বাংলার মানুষের বন্ধু হিসেবে ভূষিত করার ফলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দীক্ষার বিষয়টি সবার সামনে বিশাল হয়ে উঠেছিল। তৃণমূল পর্যায় থেকে শহরবাসী পর্যন্ত সবাই দেখেছেন তিনি কীভাবে ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের জন্য তিনি কখনো চিন্তা করেননি। বাঙালি জাতির পুরো স্বার্থ ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনার বড় পরিসর। মানুষের অধিকার বুঝতে তিনি শুধু বাঙালির অধিকারের বিষয় বোঝেননি। পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের মানুষের অধিকারের কথা তিনি চিন্তায় রেখেছিলেন। বঞ্চিত সিন্ধি, পশতু, বেলুচ, পাঠান জনগণের কথাও তিনি ভেবেছিলেন।

৬ দফা একটি জাতির স্বাধীকার বোধের নিশ্চয়তা ছিল। পাকিস্তান সরকার তা মানেনি। ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ২৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থনা ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে দেশের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে বঞ্চিত করে। ৬ দফার পাঁচ বছর পরে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হন।

*****